بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ই জুন, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৭)

অর্থাৎ, **‘আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), ‘নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।’**

এই আয়াতটি রোযা রাখার নির্দেশ, রোযার শর্তাবলী ও রোযা সংক্রান্ত শিক্ষামালার সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে রমযান এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাঝে যে বিশেষ নিবিড় সম্পর্ক আছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, **‘রোযা যেভাবে তাক্বওয়া শেখার মাধ্যম অনুরূপভাবে এটি খোদার নৈকট্য লাভেরও একটি মাধ্যম।’** সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত রমযান থেকে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি শেখা, তাক্বওয়ার মাঝে জীবন অতিবাহিত করা এবং রমযানকে খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা না করা হবে ততক্ষণ রমযান মাস দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে না। আর এটি যদি হয় তাহলে রমযানে খোদার সাথে সৃষ্ট সম্পর্ক শুধু রমযানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এক স্থায়ী পরিবর্তনের লক্ষণাবলী মানব জীবনে প্রকাশ পাবে। আল্লাহ্ তা’লা এই আয়াতে একথাই বলেছেন, **আমি সন্নিকটে, আমি কাছে আছি।** মহানবী (সা.) বলেছেন, **‘এ মাসে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে দেয়া হয় আর আল্লাহ্ তা’লা কাছে এসে যান, আল্লাহ্ তা’লা নিচের আকাশে নেমে আসেন।’** কিন্তু কাদের কাছে আসেন? তাদের কাছে আসেন যারা খোদার নৈকট্য অনুভব করে বা করার ইচ্ছা রাখে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র তা’লার কথা মেনে চলে। ‘ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ’ খোদার যে নির্দেশ রয়েছে এর ওপর আমলের চেষ্টা করে। খোদার নির্দেশাবলী খুঁজে বের করে আর সেগুলোর ওপর আমল করার এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। আর এ কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমান রাখে যে, খোদা তা’লা সর্ব শক্তির আধার। তাঁর নির্দেশাবলী শিরোধার্য করে একনিষ্ঠভাবে আমি যদি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তাহলে তিনি আমার দোয়া গ্রহণ করবেন। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদা তা’লা নিঃসন্দেহে তাঁর বান্দাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমি অতি নিকটে, আমি আমার বান্দাদের দোয়া গ্রহণ করি, আর বিশেষ করে এ মাসে তোমাদের কাছে চলে এসেছি, আমাকে ডাক, কিন্তু দোয়া কবুল হওয়ার

জন্য আমাকে ডাকার পূর্বে সেসব শর্ত মেনে চলতে হবে অর্থাৎ আমার কথা শোন, গ্রহণ কর, আমার নির্দেশাবলী মেনে চল, এগুলো হল শর্ত। আর আমার সব শক্তি ও ক্ষমতার ওপর দৃঢ় এবং পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর।

অতএব যারা বলে, আমরা দোয়া করি কিন্তু দোয়া গৃহীত হয় না, তারা আত্মবিশ্লেষণ করে দেখেছে কি? বা কখনও আত্মজিজ্ঞাসা করেছে কি যে, খোদার নির্দেশ কতটা মেনে চলছে? যদি আমাদের কর্ম না থাকে, আমল না থাকে, যদি আমাদের ঈমান প্রথাসর্বস্ব হয় তাহলে আমাদের একথা বলা ভুল হবে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ডেকেছি কিন্তু আমাদের দোয়া গৃহীত হয় নি। খোদা তা'লা কী শর্ত নির্ধারণ করেছেন এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা প্রথম কথা যা বলেছেন তাহল, মানুষের হৃদয়ে তাক্বওয়া এবং খোদাভীতির এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া চাই যার ফলে আমি তাদের কথা শুনতে এবং গ্রহণ করতে পারি।** যদি তাক্বওয়া থাকে, খোদার ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনেন এবং ডাকে সাড়া দেন। দ্বিতীয় কথা হল, তারা যেন আমার প্রতি ঈমান আনে, কেমন ঈমান? এ কথার ওপর ঈমান আনতে হবে যে, খোদা আছেন এবং তিনি সব শক্তি ও ক্ষমতার আধার। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা এবং তিনি যে সকল ক্ষমতা রাখেন এর অভিজ্ঞতা মানুষের হোক বা না হোক অথবা সে সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হোক বা না হোক, ঈমান এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁর মাঝে সকল শক্তি রয়েছে। অর্থাৎ অদৃশ্য খোদায়, অদৃশ্য সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকতে হবে। এমনটি হলে খোদার পক্ষ থেকে এমন তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হবে যার কল্যাণে খোদার পবিত্র সত্তা এবং তিনি যে সব ক্ষমতা বা শক্তির আধার আর তিনি যে দোয়ার উত্তর দেন এই সম্পর্কেও মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। প্রথমে মানুষের নিজের ঈমানকে সুদৃঢ় করতে হবে তারপর আল্লাহ্ তা'লা অগ্রসর হবেন এবং প্রমাণও পাওয়া যাবে।

দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্তাবলী, এর নীতি এবং দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যার মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে একে রমযানে খোদার নৈকট্যের মাধ্যম হিসেবে নিয়ে নিজেরা জ্ঞান এবং অন্তঃদৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হতে পারি আর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি এবং রমযানের সত্যিকার কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি।

কেউ কেউ মনে করে, আমরা যে দোয়াই করি তা অবশ্যই গৃহীত হতে হবে বা গৃহীত হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা আমি পূর্বেই করেছি, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। সেই শর্ত পূরণ করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। দোয়া গৃহীত হওয়ার নীতি কী কী, আর অনেক সময় যারা সব শর্ত দৃষ্টিতে রেখে দোয়া করে তাদের দোয়াও সেভাবে গৃহীত হয় না যেভাবে তারা দোয়া করে থাকে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

দোয়ার নীতি হল দোয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধারণা এবং কামনা-বাসনার অধীনস্ত নন। দেখ! সন্তান মায়ের কাছে কতই না প্রিয় হয়ে থাকে? তিনি চান তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। কিন্তু সন্তান যদি অনর্থক জোর দিতে থাকে আর কেঁদে কেঁদে যদি ধারালো ছুরি বা জলন্ত কয়লা হাতে নিতে চায় তাহলে মা সত্যিকার ভালোবাসা এবং প্রকৃত আন্তরিকতা সত্ত্বেও কখনো কি চাইবেন যে, তার সন্তান জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলুক বা ছুরির তীক্ষ্ণ ধারালো প্রান্তে হাত মেরে হাত কেটে ফেলুক, মোটেই নয়। একই নীতির ভিত্তিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার নীতিটিও বোঝা যায়। তিনি (আ.) বলেন, **এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। দোয়ার ক্ষতিকর কোন দিক থাকলে সেই দোয়া আদৌ গৃহীত হয় না। এ কথা ভালোভাবে বোধগম্য হওয়া সম্ভব যে, আমাদের জ্ঞান সুনিশ্চিত এবং সঠিক নয়, অনেক কাজ আমরা খুবই আনন্দের সাথে কল্যাণময় মনে করি আর ধরে নেই, এটিই কল্যাণময় বা আশিসময় হবে কিন্তু পরিণামে তা একটি দুঃখ এবং সমস্যা হিসেবে আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়। এক কথায় সকল কামনা বাসনা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, তা যথাযথ এবং সঠিক, কেননা ভুল করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। ভুল-ভ্রান্তি মানুষের হয়েই থাকে, এটি তার প্রকৃতির অংশ। তাই 'হওয়া উচিত এবং হয়' মর্মে কিছু কামনা বাসনা বা চাওয়া পাওয়া ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আল্লাহ্ যদি এটিকে সেভাবেই গ্রহণ করে নেন যেভাবে দোয়া করা হয় তাহলে তা খোদার রহমতের যে মর্যাদা রয়েছে তার স্পষ্ট পরিপন্থী কাজ হবে।**

মানুষ মনে করে, এমনটি হওয়া উচিত, এভাবে দোয়া গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের নিজের বাসনাই অনেক সময় নিজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। খোদা যদি তা গ্রহণ করেন তাহলে খোদার রহমতের যে বৈশিষ্ট্য আছে এটি তার বিরুদ্ধে যাবে। খোদা প্রার্থনাকারীর জন্য এবং বান্দার জন্য আশীর্বাদ বা রহমত চান। সে যেভাবে দোয়া করে তিনি যদি প্রত্যেকটি বাসনা সেভাবেই পূর্ণ করেন তাহলে তাঁর রহমত বা দয়া প্রদর্শনের যে মর্যাদা আছে এটি তার পরিপন্থী হবে। এটি নিশ্চিত কথা, খোদা বান্দাদের দোয়া শুনেন এবং গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দেন। কিন্তু সব দোয়া নয় কেননা; আবেগের আতিশয্যে মানুষ অনেক সময় পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখে না আর দোয়া করে কিন্তু খোদা তা'লা, যিনি সত্যিকার হিতৈষী, সত্যিকার পরিণামদর্শী, তিনি সেসব ক্ষতিকর দিক এবং অশুভ ফলাফলকে সামনে রেখে যা দোয়া গৃহীত হলে দোয়াকারীর হতে পারে, তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরিণামের ও প্রতি মানুষের দৃষ্টি থাকে না কিন্তু খোদা, যিনি বান্দার সত্যিকার মঙ্গল চান, তিনি পরিণাম এবং পরিণতি কি হতে যাচ্ছে তাও জানেন। এই দোয়া গৃহীত হলে, এই দোয়ার যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে সেই কারণে তার যে ক্ষতি হতে পারে বা যে কুফল সামনে আসতে পারে এর সবক'টি দৃষ্টিতে রেখে দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা মনে করেন, এই দোয়া প্রত্যাখ্যানের মাঝেই বান্দার কল্যাণ নিহিত। এই দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়াই তার জন্য দোয়া গৃহীত হওয়া বৈ-কী। আল্লাহ্‌র সন্নিধানে এমন দোয়া যদি গৃহীত না হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে এটিই দোয়া গৃহীত হওয়া কেননা; আল্লাহ্ তা'লা জানেন, এটি এর জন্য কল্যাণকর নয়। সুতরাং এমন দোয়া যার ফলে মানুষ দুর্ঘটনা এবং সমস্যায় জর্জরিত হতে পারে তা প্রত্যাখ্যান করার

মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন অর্থাৎ ক্ষতিকর দোয়ার তিনি দোয়া গ্রহণ করেন না। যা কল্যাণকর তা আল্লাহ্ তা'লা হুবহু গ্রহণ করেন কিন্তু যাতে বান্দার ক্ষতির দিক থেকে থাকে তা প্রত্যাখ্যান করেন, গ্রহণ করেন না, আর এটিই সেই দোয়া গৃহীত হওয়া বা কবুল হওয়া।

তিনি (আ.) বলেন, আমার প্রতি বারংবার এই ইলহাম হয়েছে যে, **'উজীবু কুল্লা দুআইকা'**। অন্য ভাষায় এভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন দোয়া যা কল্যাণকর এবং উপকারি তা গ্রহণ করা হবে, সব দোয়া গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ওলী এবং নবীদেরও কিছু দোয়া শোনেন আর কিছু দোয়া গ্রহণ করেন না আর না করার কারণ হল, তিনি জানেন, এটি কল্যাণকর হবে না বা এর ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে কেননা; খোদা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, আর তিনিই ভালো জানেন।

পুনরায় দোয়ার জন্য নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের ওপরও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

একথা সত্য, যে ব্যক্তি কর্ম এবং শ্রম বিমুখ সে দোয়া করে না। দোয়ার সাথে কর্মও আবশ্যক কেবল দোয়া নয়। এমন ব্যক্তি দোয়া নয় বরং আল্লাহ্কে পরীক্ষা করে। যদি কাজের বেলায় ঠনঠন হয় অর্থাৎ আমল না করে শুধু দোয়া করে তাহলে এমন ব্যক্তি দোয়া নয় বরং আল্লাহ্কে পরীক্ষা করছে। তাই দোয়ার পূর্বে নিজের সব শক্তিকে কাজে নিয়োজিত করতে হবে আর এটিই দোয়ার অর্থ। প্রথমে নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা মানুষের জন্য আবশ্যক কেননা, উপকরণের ভিত্তিতে অবস্থার সংশোধনই হল আল্লাহ্র রীতি, সংশোধনের জন্য উপকরণ চাই। তিনি এমন কোন উপকরণ সৃষ্টি করেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। যারা বলে, দোয়া করা হলে আর উপকরণের প্রয়োজন কী? বা দোয়া করলে উপকরণের দরকার কী? তাদের এই বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। যারা এমন কথা বলে তারা নির্বোধ, তাদের চিন্তা করা উচিত, দোয়া নিজেও তো একটি উপকরণ, এটিও কাজের জন্য একটি মাধ্যম বা কারণ হয়ে থাকে যা অন্য উপকরণ সৃষ্টি করে এবং কোন কাজ সমাধার কারণ হয়। দোয়া নিজেও প্রধানতঃ একটি মাধ্যম এবং কাজ হওয়ার উপকরণ। আর দোয়া গৃহীত হলে সেই কাজের জন্য অন্য উপকরণও সৃষ্টি হয়। কোন মানুষের হয়তো ঋণ বা টাকা পয়সা বা কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আর আল্লাহ্ তা'লা কোনভাবে, কোন মাধ্যমে তার জন্য কোন উপকরণ সৃষ্টি করে তার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন। আকাশ থেকে বৃষ্টির মত কোন কিছু বর্ষিত হয় না। কারও যদি টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় তাহলে তা আকাশ থেকে আসবে না বরং কোন মাধ্যম সৃষ্টি হবে আর সেটিই সেই উপকরণ যা দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেন। তিনি (আ.) বলেন, আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ-কে যে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এর পূর্বে রাখা হয়েছে যা একটি দোয়া সূচক বাক্য, এটি এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছে। প্রথমে إِيَّاكَ نَعْبُدُ বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই। অর্থাৎ আমরা দোয়া করি এবং একই সাথে সাহায্য প্রার্থনা করি। আর সাহায্যের দোয়ার কারণে উপকরণের প্রতিও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। অতএব আমরা খোদার রীতি এমনটিই দেখছি যে, তিনি উপকরণ সৃষ্টি করেন। দেখ! পিপাসা নিবারণের জন্য পানি, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার সৃষ্টি করেন কিন্তু কোন

না কোন উপকরণের মাধ্যমে। সুতরাং উপকরণের বিধান এভাবেই কাজ করছে। আর উপকরণ অবশ্যই সৃষ্টি হয়। কেননা খোদা তা'লার নাম দু'টোই অর্থাৎ 'وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا' (সূরা আল্-ফাতাহ্: ০৮) আযীয শব্দের অর্থ হল, সব কাজ করা, অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রম, শক্তি এবং ক্ষমতার অধিকারী, সব কাজ করতে পারেন আর করেন। আর হাকীম অর্থ হল, প্রতিটি কাজ কোন প্রজ্ঞার অধীনে স্থান এবং স্থান-কালভেদে করা। দেখ! তিনি উদ্ভিদ এবং জড় বস্তুতে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। জামাল গোটাকে দেখ! তা দু'এক তোলা খেলেই দাস্ত হয়। অনুরূপভাবে 'Scammonyরও একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন উপকরণ ছাড়াই দাস্ত হবে বা পানি ছাড়া পিপাসা নিবারণ হবে, আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করার শক্তি রাখেন কিন্তু প্রকৃতির বিস্ময়াদি সম্পর্কে অবহিত করাও আবশ্যক ছিল কেননা; প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয় ততই মানুষ খোদার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। আল্লাহ্ তা'লা যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এ সবের গুণাবলী এবং বিশেষত্বের জ্ঞান সৃষ্টি করাও আল্লাহ্‌র জন্য আবশ্যক কেননা, এসবই আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট। তিনি (আ.) বলেন, এসবের জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে ততই খোদার গুণাবলী সম্পর্কে মানুষ অবহিত হয়, এ সংক্রান্ত বুৎপত্তি লাভ হয়। আর এটিই একজন ধার্মিকের কাজ। নাস্তিক নিজের জ্ঞানকেই সবকিছু মনে করে কিন্তু একজন মু'মিন জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে খোদার গুণাবলী ও তাঁর শক্তিমত্তার জ্ঞান অর্জন করে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার দর্শন কী তা এক জায়গায় এভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আ.) বলেন, দেখ এক শিশু যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে দুধের জন্য চিৎকার করে আর তখনই সবেগে মাতৃস্তনে দুধ নেমে আসে অথচ বাচ্চা দোয়ার নামও জানে না। কিন্তু এর কারণ কী যে, তার চিৎকার দুধকে আকর্ষণ করে। এটি এমন একটি বিষয় যার অভিজ্ঞতা মোটের ওপর সবার রয়েছে। অনেক সময় দেখা গেছে, মায়েরা নিজেদের বক্ষে দুধ আছে বলে অনুভবও করেন না আর প্রায় সময় দুধ থাকেও না। কিন্তু বাচ্চার ব্যাকুল চিৎকার কানে আসতেই বক্ষে দুধ নেমে আসে, যেন বক্ষে দুধ নামার এবং বাচ্চার এই চিৎকারের এক সম্পর্ক আছে। আমি সত্য সত্যই বলছি, খোদার দরবারে আমাদের আহাজারি এবং চিৎকারও যদি এমন ব্যাকুল হয় তাহলে তা তাঁর কৃপা এবং করুণা সাগরকে তরঙ্গায়িত করে এবং তাকে আকর্ষণ করে।

এরপর মা সন্তানের যে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন এর ওপর আরো বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এটিই দোয়ার দর্শন, এর অধীনে চাওয়াই মানুষের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, আর এমনটি হলেই খোদা তা'লা তাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দান করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

চাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য আর গ্রহণ করা বা কবুল করা খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য। যে এটি বোঝে না এবং স্বীকার করে না সে মিথ্যাবাদী। শিশুর যে দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি তা দোয়ার দর্শনকে ভালভাবে স্পষ্ট করে। রহমানিয়্যত এবং রহিমিয়্যত দু'টো পৃথক বিষয় নয়। যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সন্ধান করে সে তা পেতে পারে না। রহিমিয়্যতের জন্য রহমানিয়্যতকে ছেড়ে দেবেন এটি সম্ভব নয়। রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের দাবি হল, আমাদের মাঝে রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানোর শক্তি সৃষ্টি করা। আল্লাহ্‌র যে রহিমিয়্যত অর্থাৎ তাঁর কাছে চেয়ে কিছু নেয়ার যে বৈশিষ্ট্য

রয়েছে, রহমানিয়্যতই সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। যে এমনটি করে না সে এই নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ । إِيَّاكَ نَعْبُدُ -র অর্থ হল, আমরা তোমার ইবাদত করি সেই বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে যা তুমি দান করেছ। আর এই উপকরণগুলোর একটি হল দোয়া আর অপরটি হল, সেসব জিনিসকে কাজে লাগানো যা আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। দেখ! জিহ্বা, যা রগ এবং স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত এতে লালা রয়েছে। যদি এমনটি না হত তাহলে আমরা কথা বলতে পারতাম না। জিহ্বা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে মানুষের জন্য কথা বলা সম্ভবপর হয় না। জিহ্বার কোন পেশীতে টান পড়লে তা সেখানেই অকার্যকর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দোয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জিহ্বা দিয়েছেন যা হৃদয়ের ধ্যান ধারণা প্রকাশে সহায়ক, মানুষ কথা বলতে পারে। আমরা যদি দোয়ার জন্য জিহ্বাকে কখনো ব্যবহার না করি তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য হবে। অনেক ব্যাধি এমন আছে, জিহ্বা যদি তাতে আক্রান্ত হয় তাহলে নিমিষেই জিহ্বার কর্মশক্তি লোপ পায় এবং মানুষ এক পর্যায়ে বোবা হয়ে যায়। অতএব এটি কত বড় রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আমাদের জিহ্বা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কানের গঠনে যদি পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে কিছুই শোনা সম্ভব হয় না। হৃদয়ের অবস্থাও একই। এতে বিগলন এবং ক্রন্দন আর চিন্তা ভাবনা ও প্রণিধানের যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন হৃদয় রোগাক্রান্ত হলে এর প্রায় সবক'টি হারিয়ে যায়। উন্মাদদের দেখ! তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কীভাবে অকেজো হয়ে যায়। এসব খোদা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির মূল্যায়ন করা কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়? খোদা তা'লা পরম অনুগ্রহ বশতঃ যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন এগুলোকে আমরা যদি অকেজো ছেড়ে দেই তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা খোদার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ বলে গণ্য হব। তাই স্মরণ রাখতে হবে, নিজের শক্তি বৃত্তিকে কাজে না লাগিয়ে যদি আমরা দোয়া করি তাহলে সেই দোয়া কোন কাজে আসতে পারে না। খোদা তা'লা যেসব শক্তি দিয়েছেন, সামর্থ্য দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন, উপকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে সবকে কাজে নিয়োজিত কর, এরপর দোয়া কর। এছাড়া দোয়া কোন কাজে আসে না। কেননা, খোদার প্রথম দান এবং হেবাকে যেখানে আমরা কাজে লাগাই নি সেখানে অন্যটি থেকে কীভাবে কল্যাণ বা উপকার লাভ হতে পারে। এগুলোও আল্লাহ্ তা'লারই দান যা তিনি সৃষ্টি করেছেন আর এগুলোকে কাজে লাগানো এবং দোয়া করা তবেই উপকারি বা কল্যাণকর সাব্যস্ত হতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মে দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আছে, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, বস্তুতঃ প্রকৃতির নিয়মেও আমরা দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সকল যুগে আল্লাহ্ তা'লা জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এজন্যই তিনি 'اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ' দোয়া শিখিয়েছেন। এটি খোদার ইচ্ছা এবং নিয়ম, কেউ এটি পরিবর্তন করতে পারবে না। 'اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ' অর্থাৎ আমাদের কর্মকে তুমি পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা দাও, আমাদের কর্মকে পরম মার্গে পৌঁছাও। এই শব্দগুলো সম্পর্কে প্রণিধানে বুঝা যায় যে, বাহ্যত এই আয়াতে বা এর মাধ্যমে দোয়ার নির্দেশ রয়েছে বলে মনে হয়, এখানে বাহ্যত এই ইশারা রয়েছে যে, দোয়া কর। 'সীরাতে মুস্তাকিম' বা সঠিক পথ যাচনা করার শিক্ষা বলে মনে হয়, অর্থাৎ সঠিক পথে চলার বা

পরিচালিত হওয়ার দোয়া কর। কিন্তু এর পূর্বে 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' বলছে, এটিকে লুফে নাও বা এ থেকে কল্যাণমন্ডিত হও। সঠিক পথের বিভিন্ন গন্তব্য অতিক্রমের জন্য সঠিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে খোদার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ তা'লা যেই শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন সেগুলোকে কাজে নিয়োজিত কর এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও। অতএব বাহ্যিক উপকরণের সাহায্য নেয়া আবশ্যক, যে এটিকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

তিনি (আ.) আরও বলেন, অনেক ব্যাধি এমন আছে, জিহ্বার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেয়া হয়েছে যে, জিহ্বা যদি সেসব রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে জিহ্বা বিকল হয়ে যায়, এ হলো রহিমিয়্যত। অনুরূপভাবে হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা আকুতি-মিনতি ও চিন্তা-ভাবনা এবং প্রণিধানের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। সুতরাং স্মরণ রেখ! যদি এসব শক্তি সামর্থ্যকে অব্যাহতি দিয়ে দোয়া করা হয় তাহলে তা আদৌ উপকারী বা কার্যকর হতে পারে না কেননা; প্রথম দানকে যেখানে সে কাজে লাগায় নি সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি থেকে সে কীভাবে লাভবান হতে পারে। তাই 'اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ'-এর পূর্বে 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ' রাখা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, তোমার পূর্বে প্রদত্ত নিয়ামতরাজিকে আমরা অকেজো ছেড়ে দেই নি বা নষ্ট করি নি। স্মরণ রেখ! রহমানিয়্যতের বৈশিষ্ট্য হল, রহিমিয়্যত থেকে উপকৃত হওয়ার মানুষকে যোগ্য করে তোলা। আল্লাহ্ তা'লা যে, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (সূরা আল্-মু'মিন: ৬১) বলেছেন এটি শুধু শব্দ বা বুলিসর্বস্ব নয় বরং এটি মানুষের মানবীয় সম্মানের দাবি। চাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য আর বিশেষত্ব। যে দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে না, যে এই চেষ্টায় রত থাকে না যে আল্লাহ তা'লা দোয়া গ্রহণ করুন— সে অন্যায় করে। দোয়া এক আনন্দদায়ক বা তৃপ্তিকর অবস্থার নাম। পরিতাপের বিষয় যে, সে শব্দ কোথায় পাবো যার মাধ্যমে আমি পৃথিবীর মানুষকে এই পরম আনন্দ ও স্বাদ সম্পর্কে বুঝাতে পারব? এটিতো অনুভব করার বিষয়। সারকথা হল, দোয়ার আবশ্যকীয় উপকরণগুলোর মাঝে প্রধানত যা আবশ্যকীয় তাহল নেককর্মশীল হওয়া, সেই কর্ম বা সেই কাজ করা যা করার আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন আর নিজের বিশ্বাস এবং ঈমানকে দৃঢ় করা, কেননা যে ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসের সংশোধন করে না এবং নেককর্ম বা সৎকর্মের ভিত্তিতে কার্যসাধন করে না কিন্তু দোয়া করে এমন ব্যক্তি যেন আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করছে। আসল কথা হল, 'اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ'-এর দোয়ার উদ্দেশ্য হল, আমাদের আমল এবং কর্মকে তুমি পরিপূর্ণতা দাও, উৎকর্ষতা দান কর। এরপর 'صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ' বলে বিষয়টিকে আরো খোলাসা করেছেন যে, আমরা সেই সঠিক পথের হিদায়াত চাই যা নিয়ামতপ্রাপ্ত শ্রেণীর পথ, আমাদেরকে এমন লোকদের পথ দেখাও যাদের ওপর তুমি নিয়ামত নাযিল করেছ। তিনি (আ.) বলেন, অভিশপ্তদের পথ থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর, যারা অভিশপ্ত হয়েছে তাদের পথে চলা থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, আমাদের আমল বা কর্ম যেন সবসময় সঠিক থাকে, কোন এমন কাজ যেন না হয় যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থী। যাদের ওপর অপকর্মের কারণে খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছিল। 'الضَّالِّينَ' বলে এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, তোমার সাহায্য এবং সমর্থন আমাদের লাভ হবে না এমন অবস্থা থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর। তোমার রহমানিয়্যত থেকে আমরা লাভাবান হতে পারব না, তোমার রহিমিয়্যত থেকেও বঞ্চিত হবো আর তোমার সাহায্য,

তোমার দয়া এবং কৃপা থেকেও আমরা বঞ্চিত হবো আর হাবুডুবু খাবো, এমনটি যেন না হয়। এখানে 'الضَّالِّينَ' বলে আল্লাহ্ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লার দরবারে ক্রন্দন এবং আহাজারির ফলে কিছুই লাভ হয় না মর্মে জগতপূজারীদের যে ধারণা রয়েছে তার খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

অনেকের ধারণা হল, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহাজারি ও ক্রন্দনে কিছুই লাভ হয় না । এমন ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত এবং মিথ্যা, এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর শক্তি ও নিয়ন্ত্রণের গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার বিশ্বাস থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। যখন কোন ব্যক্তি খোদার দরবারে আসে আর সত্যিকার তওবার সাথে সে প্রত্যাবর্তন করে তখন আল্লাহ্ তা'লা সব সময় তার ওপর কৃপাবারি বর্ষণ করেন।

এক ফার্সী কবিতায় কেউ খুবই সত্য বলেছে,

"আশেক কে শুদ কে ইয়ার বাহালশ্ নাযার না কারদ্, এ্যা খাজা দারদ্ নিস্ত ওগার না তবীব হাস্ত।"

'সে কেমন প্রেমিক যার প্রতি প্রেমাস্পদ তাকায়ই না। হে বান্দা! হে মানুষ! ব্যাথা বা বেদনাই নেই, নতুবা চিকিৎসক তো রয়েছে।' তোমার মাঝে বা তোমার হৃদয়ে ব্যাথা নেই, চিকিৎসক আছেন। নিজের মাঝে ব্যাথা এবং বেদনা সৃষ্টি কর, খোদা তা'লা দোয়া গ্রহণ করেন। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চান, তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর দরবারে আস। একমাত্র শর্ত হল, নিজেদেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর। এরপর يَسْتَجِيبُوا لِي মেনে চল আর সেই পবিত্র সত্যিকার পরিবর্তন যা মানুষকে আল্লাহ্র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে তা নিজের মাঝে সৃষ্টি করে দেখাও। আমি তোমাদের সত্য বলছি, আল্লাহ্র সত্তায় বিস্ময়কর সব শক্তি রয়েছে। তাঁর মাঝে অনন্ত ফযল এবং কল্যাণরাজি রয়েছে, কিন্তু তা দেখার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন। আল্লাহ্কে এমনভাবে ভালোবাস যেন তিনি দোয়া গ্রহণ করেন, সত্যিকার ভালোবাসা যদি থাকে তাহলে তিনি অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন এবং সাহায্য এবং সমর্থনও দান করেন।

আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য মানুষের কেমন হওয়া উচিত, যার কল্যাণে মানুষের দোয়া খোদা শোনেন এবং স্বীয় শক্তি ও কুদরত প্রদর্শন করেন, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

শর্ত হল আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা থাকা । আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এমন একটি বিষয় যা মানুষের হীন এবং ইতর জীবনকে দগ্ধ করে তাকে নতুন এক স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ মানুষে পরিণত করে। তখন সে এমন সব বিষয় দেখে যা পূর্বে দেখেনি, এমন কিছু শোনে যা পূর্বে শোনেনি, বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা কৃপা এবং অনুগ্রহের যে আধ্যাত্মিক আহার্য সৃষ্টি করেছেন তা থেকে সত্যিকার অর্থে লাভবান হওয়ার জন্য তিনি মানুষকে শক্তি এবং সামর্থ্যও দিয়েছেন। তাই

এগুলোকে ব্যবহার করা এবং কাজে লাগানো উচিত। যদি শক্তি সামর্থ্য দিয়ে উপকরণ সৃষ্টি না করতেন তাহলে ত্রুটি থেকে যেত। আর যদি এই উপকরণ থাকত আর তা হস্তগত করার শক্তি সামর্থ্য না থাকত তাহলেই বা কি লাভ হতো। কিন্তু না, বিষয়টি এমন নয়, তিনি শক্তি-সামর্থ্য এবং যোগ্যতাও দিয়েছেন আর উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে একদিকে খাদ্যের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন সেখানে অপরদিকে চোখ, জিহ্বা এবং দাঁত আর পাকস্থলী দিয়েছেন আর যকৃত ও অন্ত্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। এসব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন খাদ্যসামগ্রীকে। যকৃত, পাকস্থলী, অন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্র এসব কিছু খাদ্য পরিপাকের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যদি পেটে কিছু না যায় তাহলে হৃৎপিন্ডে রক্ত কোথা থেকে আসবে, খাবার প্রক্রিয়াজত হয়ে রক্তের অংশ কীভাবে হবে, এরপর আবর্জনা হয়ে কীভাবে বের হবে? অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম যে কৃপা তিনি করেছেন তাহল, মহানবী (সা.)-কে ইসলামের মত উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণ ধর্মসহ পাঠিয়েছেন। তাঁকে 'খাতামান নবীঈন' বানিয়েছেন। কুরআন শরীফের মত কামেল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দান করেছেন; এরপর কিয়ামত পর্যন্ত কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না, কোন নতুন নবী নতুনকোন শরীয়ত নিয়েও আসবে না। এরপর চিন্তা এবং প্রণিধানের যে শক্তি রয়েছে সেগুলোকে যদি ব্যবহার না করি, খোদার দিকে যদি অগ্রসর না হই তাহলে কত বড় আলস্য এবং ঔদাসীন্য এটি। একটু চিন্তা কর, আল্লাহ্ তা'লা প্রথম সূরাতেই কত বিস্তারিতভাবে কৃপাধন্য হওয়ার রীতি শিখিয়েছেন।

অতএব এই হল লাভবান হওয়ার রীতি। মহানবী (সা.)-এর মত নবী আমাদেরকে দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সুন্নত অনুসরণ করতে পারি। তিনি আমাদেরকে কুরআনের মত গ্রন্থ দিয়েছেন যেন আমরা এই কুরআনের আদেশ নিষেধ মেনে চলতে পারি। তিনি (আ.) বলেন, এই প্রথম সূরাতেই অর্থাৎ সূরা ফাতিহায় কত বিস্তারিতভাবে কৃপাধন্য হওয়ার দোয়া শিখিয়েছেন। এই সূরা, যার নাম হল 'খাতামাল কুতুব' এবং 'উম্মুল কুতুব', মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন এবং তা কীভাবে অর্জন করা যায় তাও বলেছেন। 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ' মানবপ্রকৃতির মূল দাবি এবং মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর এটিকে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এর পূর্বে রেখে বলেছেন, প্রথমে আবশ্যক হল, যতটা সম্ভব মানুষের শক্তি-সামর্থ্য এবং বোধ-বুদ্ধি যা আছে তা ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা এবং সংগ্রাম করা আর খোদা প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো, এরপর খোদার কাছে এর পূর্ণতা, উৎকর্ষতা এবং ফলপ্রদ হওয়ার জন্য দোয়া করা।

খোদাকে চেনার উপায় কী? তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

এটি সত্য কথা যে, خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا (সূরা আন্-নিসা: ২৯) মানুষ দুর্বল সৃষ্টি, সে খোদার কৃপা এবং বদান্যতা ছাড়া কিছুই করে উঠতে পারে না। খোদার কৃপা না থাকলে কিছুই করা সম্ভব হয় না। তার অস্তিত্ব, তার লালন-পালন, তার স্থায়ীত্বের পুরো উপকরণ নির্ভর করে খোদার কৃপার ওপর। নির্বোধ সে, যে নিজের বোধ-বুদ্ধি বা নিজের সম্পদ নিয়ে গর্ববোধ করে, কেননা এসব কিছু খোদারই দান, সে কোত্থেকে এনেছে এসব? দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হল, মানুষের নিজের দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতাকে দৃষ্টিতে রাখা। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সে যতই ভাববে

এবং চিন্তা ও প্রণিধান করবে ততই নিজেকে খোদা তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী দেখতে পাবে। এভাবে দোয়ার জন্য এক প্রকার আবেগ এবং উচ্ছ্বাস তার মাঝে সৃষ্টি হবে। অনেকে বলে দোয়ার জন্য জোশ এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় না, তাদের মূলতঃ নিজেদের সীমাবদ্ধতার ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত। খোদার প্রতি ভালোবাসার দাবি পূরণের চেষ্টা করলে এক ধরনের জোশ, এক আবেগ, এক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হবে। মানুষ যখন সমস্যা কবলিত হয়, দুঃখ এবং অসচ্ছলতার মুখোমুখি হয়, প্রচণ্ড চিৎকার করে এবং ডাকে আর অন্যের কাছে সাহায্য চায়, অনুরূপভাবে যদি সে নিজের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে চিন্তা করে আর প্রতিটি মুহূর্ত যদি নিজেকে খোদার সাহায্যের মুখাপেক্ষী মনে করে তাহলে তার আত্মা আকুল আবেগ এবং ব্যাকুলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সিজদাবনত হবে এবং কাঁদবে, আহাজারি করবে আর 'ইয়া রাব্ব, ইয়া রাব্ব' অর্থাৎ হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু! বলে তাঁকে ডাকবে। গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআনের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত কর তাহলে তোমরা জানতে পারবে, প্রথম সূরাতেই আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শিখিয়েছেন, اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ তিনি বলেন, দোয়া তখনই সকল বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হতে পারে যদি তা কল্যাণকর হয় এবং স্থান-কাল ভেদে করা হয়। সকল ক্ষতিকর বিষয় থেকে এটি মানুষকে রক্ষা করে। সেটিই দোয়া যা সকল প্রকার কল্যাণে সমৃদ্ধ, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং যা মানুষের জন্য উপকারী। মানুষের জন্য যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে তা থেকে তাকে রক্ষা করার সেসব বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখে ও সেসব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ থেকে الضَّالِّينَ পর্যন্ত দোয়ায় যত কল্যাণকর দিক থাকতে পারে সম্ভাব্য সকল কল্যাণের দোয়া এতে করা হয়। আর সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতিকর দিক যা মানুষকে ধ্বংস করে তা থেকে মুক্তি এবং পরিত্রাণের দোয়া এটিই।

সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে, সবচেয়ে বড় যেসব দোয়া এই সূরায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা জাগতিক কোন দোয়া নয় বরং ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত দোয়া। তাই নিজেদের ধর্মের হিফাযত এবং সুরক্ষার জন্য দোয়াকে অগ্রগণ্য করা উচিত। দোয়া করলেই খোদার নৈকট্যের দ্বার উন্মোচিত হয় আর এর ফলে বাকী সব দোয়া আপনা-আপনি গৃহীত হয়ে যায়। প্রকৃত দোয়া হল, ধর্মের দৃঢ়তার জন্য দোয়া করা, আর এটিই খোদার নৈকট্য অর্জন এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

' أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ' অর্থাৎ আমি তওবাকারীর তওবা গ্রহণ করি। আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি সেই অঙ্গীকারকে বৈধ আখ্যা দেয় যা সত্যিকার তওবাকারী করে থাকে। যদি খোদার পক্ষ থেকে এ ধরণের প্রতিশ্রুতি না থাকত তাহলে তওবা গৃহীত হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। আন্তরিকভাবে কৃত অঙ্গীকারের ফলে যা হয় তাহল, আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর সকল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, যা তিনি তওবাকারীদের সাথে করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার হৃদয়ে এক আলোর প্রতিফলন ঘটতে থাকে যখন মানুষ অঙ্গীকার করে, আমি সকল পাপ এড়িয়ে চলব আর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্য ও দোয়া গৃহীত হওয়ার যে রীতি উল্লেখ করেছেন এর মাঝে সবচেয়ে উন্নত মাধ্যম হল, নামায। নামাযের অবস্থা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল দোয়া, আর দোয়া করা আল্লাহ্‌র একান্ত প্রকৃতি সম্মত। সচরাচর আমরা দেখে থাকি একটি শিশু যখন ক্রন্দন করে, উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তখন মা কতটা ব্যাকুল হয়ে তাকে দুধ পান করান। প্রভুত্ব এবং দাসত্বের মাঝে এমনই একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যা সবার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন খোদা তা'লার দরবারে সিজদাবনত হয়ে পরম বিনয়ের সাথে ও আকুতি মিনতির সাথে তাঁর সামনে নিজের পুরো চিত্র তুলে ধরে আর নিজের চাওয়া-পাওয়া তাঁর কাছেই উপস্থাপন করে তখন প্রভুর বদান্যতা অবশ্যই প্রকাশিত হয় আর এমন ব্যক্তির প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়। খোদার কৃপা এবং বদান্যতার দুগ্ধ এক ক্রন্দনের দাবী রাখে, এক আহাজারির দাবি রাখে। তাই খোদার ফযল এবং বদান্যতার দুগ্ধ যদি পান করতে হয় তাহলে তাঁর দরবারে বিনয় এবং আকুতি-মিনতির সাথে ক্রন্দন করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, এর জন্য ক্রন্দনশীল দৃষ্টি বা চোখের প্রয়োজন।

সুতরাং রমযানে যেখানে অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ আল্লাহ্‌র ফযলে মসজিদের প্রতিও নিবদ্ধ, আর বাজামাত নামাযের প্রতিও মনোযোগ রয়েছে, সেই সাথে নফলের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এরপর সেসব দোয়া যা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং খোদার নৈকট্য লাভের জন্য হয়ে থাকে সেগুলোকে আমাদের অগ্রগণ্য করা উচিত। এগুলোই প্রথম দোয়া হওয়া উচিত আর পরে জাগতিক দোয়া আসা উচিত। আমাদের যেসব জাগতিক উদ্দেশ্যে চাওয়া-পাওয়া রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তা পূর্ণ করবেন।

এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া উপস্থাপন করব যা এই দিনগুলোতে আমাদের বিশেষ ভাবে করা উচিত, যেন খোদার নৈকট্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে তিনি (আ.) দোয়া করেন,

হে বিশ্ব প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই, তুমি পরম দয়ালু এবং বদান্যশীল। আমার প্রতি তোমার অশেষ কৃপা রয়েছে। আমার পাপ ক্ষমা কর, কোথাও যেন আমি ধ্বংস না হয়ে যাই। আমার হৃদয়ে তোমার খাঁটি ভালোবাসা সৃষ্টি কর যেন আমি জীবন লাভ করতে পারি, আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখো আর আমাকে এমন কাজের তৌফিক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। তোমার মহাসম্মানিত চেহারার দোহাই তুমি আমাকে ক্রোধ থেকে রক্ষা কর, করুণা কর, কৃপা কর, ইহ এবং পরকালের বালা এবং বিপদাবলী থেকে আমাকে রক্ষা কর কেননা; সকল কৃপা এবং বদান্যতা আর অনুগ্রহ তোমারই হাতে। আমীন, সুম্মা আমীন।

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পারি। এ রমযান আমাদের সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুক এবং স্থায়ীভাবে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুক আল্লাহ্‌তে যাদের ঈমানে দৃঢ়, যারা তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি কর্ণপাত করে এবং সেই অনুসারে আমল করে আর নিজেদের প্রতিটি কাজের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয় ও অগ্রগণ্য করে। আমাদের প্রতিটি কাজ যেন সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টি অনুসারে হয়, আমাদের বিশ্বাস যেন পূর্বের চেয়ে

বেশি দৃঢ় হয়, আমাদের মাঝে খোদার সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টি হোক, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইহ এবং পারলৌকিক সমস্যাবলি থেকে রক্ষা করুন।

নামাযের পর দু'ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা হবে। তাদের একজন হলেন শ্রদ্ধেয় রাজা গালেব আহমদ সাহেব। তিনি জামাতের একজন প্রবীন খাদেম ছিলেন, উর্দূ ভাষার প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি শিক্ষাবীদ এবং শিক্ষা বিশারদ ছিলেন। সরকারী চাকরী করেছেন, পাঞ্জাব টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন। ২০১৬ সনের ৪ঠা জুন লাহোরে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯২৮ সনে গুজরাত শহরে জন্মগ্রহণ করেন, তার পিতা হযরত রাজা আলী মোহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ১৯০৫ সনে তিনি বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। তার পিতা কাদিয়ানে নাযের মাল এবং নাযেরে আলা হিসেবে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। রাজা গালেব সাহেবের নানা ছিলেন মালেক বরকত আলী সাহেব। হযরত মালেক আব্দুর রহমান খালেদ (যিনি খালেদে আহমদীয়াত ছিলেন) তিনি তার মামা হন। তিনি লাহোর থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন, কাদিয়ানে উচ্চমাধ্যমিক আর লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে সাইকলোজিতে মাষ্টার্স করেন এবং ১ম স্থান অধিকার করেন। কবি, বুদ্ধিজীবি এবং শিক্ষাবিদ আর সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে বিশেষ জ্ঞানী এবং সাহিত্যিক শ্রেণীর মাঝে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। আল ফযলের পাশাপাশি দেশীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়ীকিতে তার রচনাবলী এবং কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে চাকরির মাধ্যমে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। এরপর ১৯৬২ সনে পাঞ্জাব শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যেমন, জেনারেল সেক্রেটারী এবং কন্ট্রোলার বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট, পাঞ্জাব মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারী, সারগোধা উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব টেক্সট বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টা হিসাবেও উল্লেখযোগ্য সেবা করেছেন। তার জামাতী সেবার ইতিহাসও অনেক দীর্ঘ। লাহোরে জেনারেল সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী তালীম এবং আরো বেশ কিছু পদে খিদমত করেছেন। ১৯৭৪ সালে জামাতে আহমদীয়ার মুখপাত্র হিসাবে বেশ কয়েকবার সংবাদ সম্মেলন করেছেন, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং বিবৃতি দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ফজলে ওমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। ডাইরেক্টর ওয়াক্‌ফে জাদীদ ছিলেন ১৯৭৪ থেকে ৮৫ সাল পর্যন্ত, এছাড়া নাসের ফাউন্ডেশনের নায়েব সদর বা ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন। খুবই সহজ-সরল এবং শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, জামাতের কর্মকর্তাদের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মাগফিরাত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার নিজের কোন সন্তান ছিল না, এক পালক কন্যা আছে, আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য দিন।

দ্বিতীয় জানাযা মুকাররম মালেক মোহাম্মদ আহমদ সাহেবের, তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন, ২০১৬ সনের ৬ই মে ইন্তেকাল করেন। এই উভয় জানাযা গত শুক্রবারে পড়ানোর কথা ছিল কিন্তু কোন কারণে পড়ানো সম্ভব হয়নি। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ ফযল আহমদ সাহেব বাটালভী (রা.)-এর বড় পুত্র ছিলেন। খলীফাদের এবং খিলাফত ব্যবস্থার সাথে আনুগত্য, আবেগ এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। সন্তানদেরও এই বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হওয়ার নসীহত

করতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি অনুগত, ভদ্র, মিশুক, বিনয়ী, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহমর্মী, স্নেহশীল, সহানুভূতিশীল এবং নেক মানুষ ছিলেন। সারা জীবন বেশ কিছু মানুষের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন, অনেক ছেলেমেয়ের পড়াশুনার দায়িত্ব বহন করেছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই দায়িত্বগুলো তিনি খুব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাহরীকে জাদীদের দপ্তর আউয়ালের পাঁচ হাজার মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য তাহরীকে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রেও উদার মনোভাবের পরিচয় দিতেন। রাবওয়ায় একটি ভূমিখণ্ডও তিনি জামাতের হাতে তুলে দিয়েছেন। ১৯৪৫ সালের ২০শে অক্টোবরে তিনি ধর্মের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করেন। প্রথমে তিনি বাইরে চাকরী বা কাজ করতেন, এরপর জীবন উৎসর্গ করেন। রাবওয়ায় নির্মাণ বিভাগে ১৯৪৯ থেকে ৫৫ সাল পর্যন্ত খিদমত করেছেন, ৫৫ থেকে ৬৮ সাল পর্যন্ত ওকালত তবশীর বিভাগে সুপারিনটেনডেন্ট বা অধীক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৬৯ থেকে ৮২ পর্যন্ত নায়েব অফিসার আমানত হিসাবে খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। ৮২ থেকে ৮৬ পর্যন্ত নায়েব উকিলুল মাল সানী হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ৮৫ তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ এর জুন পর্যন্ত পুনরায় নিযুক্ত হয়ে জামাতের খিদমত বা সেবা করা অব্যাহত রাখেন। ৮৬ থেকে ৮৯ পর্যন্ত নায়েব উকিল তা'মিল ও তানফিয হিসেবে কাজ করেন। প্রায় ৪৭ বছর জামাতের খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। এরপর তিনি নিজ সন্তানের কাছে জার্মানী স্থানান্তরিত হয়। খুবই ইবাদতগুযার ও কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর অধ্যায়ন ছিল ব্যাপক। আল্লাহ্‌র ফযলে মুসী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে ২ পুত্র এবং ৪ কন্যা রেখে গেছেন। আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ লেইক তাহের সাহেব তার ছোট ভাই, এখানে আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালেও ওয়াকেফে যিন্দেগী কর্মী মালেক মাহমুদ সাহেব তার ছোট সন্তান। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন এবং তাকে কৃপাধন্য করুন, তার সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জামাত এবং খিলাফতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।